প্রকাশিকা :
শ্রীবহ্নিশিখা ঘোষ
গ্রন্থ-প্রচার
২০/এ গোবিন্দ সেন লেন
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ : শ্রীসজল রায়

প্রথম প্রকাশ :
ফাল্গুন, ১৩৪৬

মুদ্রাকর :
শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ
সুশীল প্রিণ্টার্স
২ ঈশ্বর মিল বাই লেন
কলিকাতা-৬

মা ও বাবাকে

সূচীপত্র

এক হাজার এক (হাজার দুয়ার খোলা) ১
বুকের ভিতরে খেলা করে (আছে আছে সব আছে) ২
বুকের ভুরুতে ভাসে (অর্থময় কান্না শুধু) ৪
তবু বান আসে (সব কিছু সাজানো হলেও) ৫
কিছুতেই পারো না সরাতে (কিছু অনাবৃত নয়) ৬
বসন্তের চিঠি (রাজন্ হে একবার) ৮
কতদিন পরে যে এলাম (আকাশ তোমার মুখ) ৯
তুমি আমি নিঃসঙ্গ সময় (এবার তোমার কাছে) ১০
দীঘায় (বহু পুরাতন কোন) ১১
রূপনারায়ণ (নাই বা পেলাম রোদ) ১২
লগ্নোত্তর (তুমি তো বলিষ্ঠ হাতে) ১৩
পসরায় কড়ি গুণে নেয় (সময়ের ভারী চাকা) ১৪
ভিয়েতনামী সেই প্রেমিককে (নক্ষত্রকে ভালবেসে) ১৫
যাদুর আয়নাটাকে উল্টে দিয়ে (কাউকেই ঠিক নামে ডাকা যায় না) ১৬
হঠাৎ নাড়ালে হাত (রোদ বড় ভালো লাগে) ১৭
কার পাপ মানুষের কাছে কম ছিল (বাঘমুণ্ডির পাহাড়ে) ১৮
কবিতা লিখতে হবে (সুবাসিত কবিতা পাঠক) ২০
পোষাক নেই বলে অন্ধকারে (সবই তো ঘর থেকে) ২১
ধাবমান পুচ্ছের পেছনে (আমিও তো বসেছি অমনি) ২২
বেদম চ্যাচাতো (ঈশ্বর কখনও কোন) ২৩
অভিনয়ে কষে ঘুম দেবো (মদের ভাণ্ডটি চোরে) ২৪
কখনও তোমার মুখ (কখনও তোমার মুখ) ২৫
নিঃশব্দ হিমাঙ্কে নেমে যেতে (ঝড়জল অন্ধকারের দিন) ২৬
তারপর সব কিছু (তারপর সব কিছু) ২৮
কে কাকে যে ডাকে (কে কাকে যে ডাকে) ২৯
আরো অন্ধকার ঘরে (পর্দাটাই নড়ে চড়ে) ৩০
না (না আমি ছিড়বো না কুঁড়ি) ৩১

দিঘিটা শুকোবে (নৈঃশব্দ অসহ। তাই ২
উজানে (কে আমার নাম ধরে) ৩৩
কে আর নাবিক নয় (নাবিক বুকের মাঝে) ৩৫
সন্ন্যাসী বান্ধবীকে (সে মেয়ে জানালা দিয়ে) ৩৬
সেই চৈত্রের ছড়া (এপার বাংলা ওপার বাংলা)
কোনো বন্ধুকে (তোমাকে মানবী বলে) ৩৯
আগুন খুঁজেছিলে (তুমি তার চোখের দিকে) ৪১
সেই ভীড়ে জীবন থাকবে না (জীবন বড় মজার) ৪২

এক হাজার এক

হাজার দুয়ার খোলা—পদব্রজে অশ্ব রথ গজে
যেদিকেই যাবে তুমি খোলা আছে অসীম সড়ক ;
অথবা পুষ্পকে কোন স্বর্গের সীমায় দিয়ো হানা
পকেটে ঠিকানা রেখে যেতে পারো অতল নরক ।

যেদিকেই যাবে তুমি ধৈর্য্য ধরো সময় দয়ালু
দুই হাত ভরে দেবে যত তার দুর্লভ হীরক ;
একটি দুয়ার তবু কোনদিন খুলিবে না তার
অদৃশ্য কপাট লৌহে নিষেধের কঠিন কীলক ;

তবুও খোঁপায় জবা শবরী সে মেয়েটি তো তাকে
বলেছে যখন এক ক্লান্ত আর অন্ধ বাসনায
পকেটে ঠিকানা রেখে উত্তর বা পূবে তুমি ঘোরো
নিঃশব্দ কৌতুকে সেই দ্বার অনায়াসে খুলে যায় ।

হাজার দুয়ার খোলা । শুধু সেই এক হাজার এক
কখন যে খোলে সেই মেয়েটিও কখনো বলে না ।

বুকের ভিতর খেলা করে

আছে আছে সব আছে।
সেই হাঁসগুলো বুকের ভিতরে আজো শব্দ করে ওড়ে।

তুমি সেই উত্তরের নিষিদ্ধ দুয়ার খুলে
বরাবর সোজা চলে যাও।—সব পাবে।
সেই ভাঙা বিশাল প্রাসাদ
অসুখী হেনার গন্ধ, সাপের খোলস
অন্ধকার ছায়ামাখা অদ্ভুত মুখোশে
অলৌকিক প্রাচীন অশথ
ফাটা ঘাটলায় জলে আলোতে কালোতে
বাকলার ফাটাফুটি হরপ্পার জীবিত চিত্তিরে
অনেক সুড়ঙ্গ খুলবে।

আমি অদ্দূর যাবো না।
পাথরে দুকান পেতে
শীতল জলের ধ্বনি তুলে নিয়ে
হাঁসেদের খোঁজে চলে যাব।

আছে আছে সব আছে—
সেই হাঁসগুলো অদূরেই :
বনকলমীর ঝাড়ে
অশথের অদ্ভুত আঁধারে
আলোতে কালোতে
ডানার সুগোল ছাঁদে জল ঝেড়ে রোদ ছেড়ে
জল বিম্বে অবিরত গল্প লিখে লিখে
বুকের ভিতরে খেলা করে।

বুদ্ধের ভুরুতে ভাসে

অর্থময় কান্না শুধু অবোধেরই গালে ঝরে
এ কথা জেনেও
আমরা অথৈ জলে লম্বা লগি ধরে
তু বাঁও মেলে না······তিন
অবিশ্রাম হাঁক দিয়ে যাই ;
পুরোমাপ মেলাবার লগি কার জুটেছে জানি না।

সব দিন ভিজে নয়,
সব মেঘে ঝড়ও বয় নাকো ;
কিছু সুখী পাখি প্রাণ এখনও আকাশে নীড় করে
এসব জেনেও সেই লম্বা লগি ধরে
তুমি আমি চিরকাল
বাঁও মেপে নৌকো বেয়ে যাবো।

বেনো জলে ভাসার পরেও—
উঁচু সড়কের তাজা কাঁঠাল গাছটা
মসৃণ পাতায় রোদে জেগে আছে বুঝি
আমরা অথৈ জলে লম্বা লগি ধরে
তাই হাঁকি
তুবাঁও মেলে না······তিন—
অর্থহীন সুখ শুধু বুদ্ধের ভুরুতে ভাসে
এ কথা জেনেও।

তবু বান আসে

সব কিছু সাজানো হলেও—
ফুলদানে রঙিন গোলাপ, পর্দা বাটিকের
যামিনীরায়ের ছবি, অর্কিড—শ্যাম বা সোনালী
জানালায় বসে
হঠাৎ জাননা তুমি
সবকিছু এলোমেলো করে কবে বান আসবেই।

তুমি সাগর বা প্রপাতের স্রোতে মুখ রেখে
আদিম অরণ্য ঘ্রাণবাহী কোন ভীষণ সবুজে
কিংবা নিতান্ত নিরীহ
ছায়ার দুপুর কোন
ঘনপাতা ঘুঘুডাকা ম্লান
বুকের আঁধার থেকে বের করে প্লাবিত হবেই

তুমি আমি আমরা সবাই
যশোদার ননীভাণ্ডে মুখ রেখে
মক্ষিকা স্বভাবে বিস্তারিত।
তবু বান আসে।
দেয়ালের নোনা ইট সহসা খসলে
অদ্ভুত রঙের মাছ হয়ে ভেসে যাই।

কিছুতেই পারো না সরাতে

কিছু অনাবৃত নয়।
উন্মোচিত দেহের ভঙ্গীরও আবরণ থাকে কিছু
কিছুতেই পারো না সরাতে।

কতদূর যাবে?
আকাশ সমুদ্র বন—নির্ভার দেহেও
কতদূর যেতে পারো তুমি?
শব্দের জাঙাল ভেঙে অন্যতর অরণ্যে ঢুকবে ;
তবু নিরন্ধ্র নিশীথে
বিশাল শালেরা যদি থাবা মেলে পিছু হটবেই।

তুমি সাগরে ভাসাতে পারো ভেলা।
জলধি অবধিহীন এবং মরঞ্জয়ী তুমি।
অশান্ত তুফানে তবু ঢেউয়েরা আকাশ হতে
তীরে দেবে ছুঁড়ে।

হয়তো আকাশই অবারিত।
নীলাকাশ মহাকাশ
পায়ের পাখনা মেলে ভেবেছিল সীমানার
বেড়াগুলো এড়াবে এবার

কি করে জানবে তুমি
কোন রাঙা মেঘ ভেঙে প্রমত্ত হাওয়ার ঝড় এসে
পাখির মতন তুমি, মাছের মতন তুমি
নেউলের মত
বিবরেই লুকাবে আবার।

দেহমাপ সীমানার অন্ধকারে স্তিমিত চেতনে
আকাশ অরণ্য জল ডুবে যাবে ছায়ার মিছিলে।

বসন্তর চিঠি

রাজন্ হে, একবার আসবে নাকি ?
সোজা চলে এস।
কদ্দিন নিজেকে আর নিরাপদ গর্তের গভীরে
ঘৃণায় বা শুচিতায় শামুকের মত
আজীবন টেনে যাবে।

আমি অনেক ভেঙেছি রোদ ;
শীতের ধূসর মাঠের ভিজে ঢেলা ভেঙে
কুয়াশায় কেঁপে পথ হেটেছি অনেক ;
অনেক হিজলমাঠে হামাগুড়ি দিয়ে
সতর্ক শিয়ালকাঁটা নখে চিরে
বীজাঙ্কুর সংগোপন প্রক্রিয়া দেখেছি।
আমি মাদার ও শিমুলের কর্কশ বাকলে
গাল ঘসেছি অনেক।

রাজন হে, দেরী কেন ?
বাসি মুখে সোজা চলে এস
পাড়ার সীমিত মাঠে।

মাদার ও শিমুলের রঙিন পোস্টার
সীমা ভাঙবার মত শব্দ কিছু অতর্কিত
অবারিত বাতাসে ওড়ায়।

কতদিন পরে যে এলাম

আকাশ তোমার মুখ প্রণয়ের গাঢ়তম চোখে
কতদিন দেখি নাই। ভুলে গেছি ভঙ্গিল চিবুক
মুখের নরম ডোল, আলোকাঁপা কাজলের পাতা
ঘুমরং রূপকথা আঁকা সেই ছায়াভরা বুক।
আকাশ, তোমার কাছে কতদিন পরে যে এলাম।

এবার তুমি ও আমি এই নীল মেঘের ছায়ায়
অনেক সাঁতার দেব। ভরা আষাঢ়ের এই নদী ;
ঝাউয়ের ছায়ারা কাঁপে, টুপটাপ ঝরছে বকুল—
একান্ত গোধূলী এলে যেমন বুকের ভাষা ঝরে।
আঁধার নামলে আজ গোধূলীর মেঘ হয়ে যাব।

কৃপণ হয়োনা আজ। দুচোখে রয়েছে যত মধু
সব দাও। কাল আমি হয়তো বা আবার নিজেকে
হারাবো অনেক ভীড়ে। ভুলে যাবো নিজের দুচোখে
এত রং লেগে থাকে এত নেশা গোলাপী আমেজ।
আকাশ, হয়তো কাল ঘুমে ভোর পার করে দেব।

তুমি আমি নিঃসঙ্গ সময়

এবার তোমার কাছে। চারিধারে বৃষ্টি নেমে এলে
বিষণ্ণ বাতাস ভিজে মেঘ পাখি বৃক্ষলতা ছায়া
কুয়াশার মত সব অন্তরঙ্গ ঘরে নিয়ে আসে।

সে সময় যাবতীয় রোদছবি বা ছবির রোদ মুছে যায় ;
রৌদ্র যেন দূরে চলা সুকুমার স্মৃতির পথিক
আমাদের ঘরে বা দুয়ারে
কোনদিন আসেনি বা আসবে না।

সব অর্থহীন ধ্বনি
দূরাগত বহে আনে
সময়ের সার্থক আবেশ।
সন্ধিলগ্ন সমাগমে
দেয়াল দুয়ার পর্দা সুপ্রচুর হেসে
ভয়ঙ্কর বেগে উড়ে যাবে।

তারপর তুমি আমি নিঃসঙ্গ সময় বৃষ্টি
ঝড়ো হাওয়া সনাতন উদ্দাম মেঘেরা।

দীঘায়

বহু পুরাতন কোন রমণীর মত তুমি স্থূল
অথচ কিছুটা নেশা পাওয়া চাই জীবনের দায়ে
অতএব হাত রেখে আকাশের পিঙ্গলে বা নীলে
ভেঙে চলি কটুস্বাদ দুপুরের অগণ্য মিছিল।

বহু পুরাতন কোন রমণীর মত তুমি, মাটি,
হেজে মজে গেছ ; তাই জীবনের অন্যতর মানে
তোমার চোখের কিংবা বুকের আয়নায় ধরা পড়ে নাকো
শুনে আকাশটা অকস্মাৎ হেসে উঠল মাতালের হাসি।

"চিরন্তন অতি স্থির যৌবনার মত তুমি"—
আমি পুরাতন আকাশকে এই বলে মত্ত সেই জলে
ঝাঁপাতে দেখলাম। জীবনের অন্যতর মানে
ঘাস ফুল প্রজাপতি পাখি হয়ে শূন্যে উড়ে গেল।

সব রোদ ঝাউ পাখি অবশেষে নেশা হয়ে গেলে
আমি তার অতি দীর্ঘ অরণ্য বা মরণের মত
কালোচুলে হারিয়ে গেলাম।

রূপনারায়ণ

নাই বা পেলাম রোজ। বুকে রেখে বুকের গরম
চুলের দামাল ঢেউয়ে গাঢ়তম আদরের ছোঁওয়া
না দিলাম। এই ভালো। এই ঢের ভালো করে পাওয়া
প্রত্যহের চেয়ে দূর—আকস্মিক—অকস্মাৎ হওয়া।

রয়েছে কোথাও এই সুখ থাক মনের গভীরে
পেয়েছি কোথাও সীমাহীন লোনা জোয়ারের স্বাদ
আবর্তিত আবেগের ঘায়ে ভাঙা সীমার আকাশ
সাগর ছোঁয়ানো ঢেউ ছুঁয়ে ঢেউ হয়েছি কখনো।

প্রেম তো হওয়াই। প্রেম শুধু এক দুর্লভ জ্ঞাপন
আমি আছি। তারপর যন্ত্রণায় যে যার খোলস
গুঁড়ো করে পাখি নদী ঢেউ ঝড়-যে যার আপন
দর্পনে গোপন দেহ দেখে হয় বিদ্যুত বা দীপ।

তুমি আছ। আজো তাই সত্তালোপী জনতার ভীড়ে
অকস্মাৎ কোনো পাখি পাড়ি দেয় পীতোজ্জ্বল তীরে।

লগ্নোত্তর

তুমি তো বলিষ্ঠ হাতে অর্গল খুলেছো।
সায়াহ্নের ধূসর আঁধারে
দেখিয়েছ পুরাতন অরণ্যের মত সেই দুর্গ ও প্রাসাদ
মর্মরিত উপবন, শৈবালিত দিঘির ঘাটলা
জটিল জোৎস্নারেখা হেনা ঝাড়,
অদ্ভুত আলোকে
কুণ্ডলিত সাপের খোলসও।

সব—সব দেখে
জমাট রক্তের মত ইরাণী গোলাপ ছিঁড়ে
চুলে বুকে দিয়ে
নরম ধূলোর বুকে পদচিহ্ন এঁকে এঁকে অলিন্দে সোপানে
পাঁচ মহলার
সেই রুদ্ধ দ্বারে এসে শুধু
অতি ঋজু মন্ত্রকটি অনুচ্চার রেখে নীল ঠোঁটে
রাত্রির শাণিত ধারে স্তব্ধ আমি নিরুচ্চারে
নিঃশেষ হলাম।

পসরার কড়ি গুণে নেয়

সময়ের ভারী চাকা কাঁধে ঠেলে শরীর অনড়
ক্ষণ অবসর
আয়ান ঘোষের চোখ ফাঁকি দেওয়া রাধার মতন
এলেও দুহাতে তার এলোখোঁপা ভেঙে দেব
ফুরসুৎ কোথায় ?
সে দুটো চাঁপার কুঁড়ি ফেলে যায়
সুবাস তাহার
লোভ ক্ষোভে ক্রোধ শেষে ঘৃণা হয়ে
দুচোখ পোড়ায়।

আয়ান ঘোষের রাধা,
গোয়ালের সব গাই ঘাস জল পেলে
কনক চাঁপার কুড়ি সুঠাম বুকের
ভাঁজে রেখে ছল করে জলে যেতে চাও।
আজো তাই ভালবাসি।
ভালোবাসা নির্বিচারে তোমাকে পোড়ায়।

নির্বীজ আয়ান ঘোষ,
ক্রোধ করি ঘৃণা করি—করুণাও।

হাটের ধূলায় চাঁপার পালক গুড়ে
বিনোদিনী উবু হয়ে
পসরার কড়ি গুণে নেয়।

ভিয়েতনামী সেই প্রেমিককে

নক্ষত্রকে ভালোবেসে অন্ধকারে চোখ জ্বলে কারো ;
কেউ ডানা ঝাপটিয়ে অদ্ভুত আগুনে
দীর্ঘ হাউই ওড়ায় ;
সামাজিক সব আলো নিভে গেলে কেউ
দূরতম নদীতীরে যাবতীয় স্থাবর জ্বালায়।
নক্ষত্রকে ভালোবেসে—ভালোবেসে সব।

অথচ করুণ মাটি ভরা বুক তখনো গভীর
প্রত্যাশায় বসে থাকে।
বহতা বাতাসে ধোঁয়া ওড়ে অবশিষ্ট দীর্ঘ বাঁশ ঝাড়ে,
ঘুরপাক খায় শূন্যে অতিদ্রুত শকুনি শরীর ;
ছায়ানামে ফসলের ক্ষেতে।
অন্ধকার গাঢ় হলে দীর্ঘ হবে বাদুড়ের পাখা।

অন্ধকার গাঢ় হলে যখন কৌতুকে ঢের
ফানুস ভেসেছে
কালো চোখ কামার্ত প্রেমিক
নিজের কলিজা জ্বেলে কাঁচা ধান ক্ষেতে
সারারাত মহিলার মুখ দেখে ছিল।

যাত্নর আয়নাটাকে উল্টে দিয়ে

কাউকেই ঠিক নামে ডাকা যায় না।
শব্দগুলো যথেচ্ছ ছড়িয়ে
আঁকাবাকা মুখ যেন যাত্নর দর্পণ থেকে
ডেকে নিয়ে আসে।

অথচ অবিশ্রাম আপ্রাণ যতনে
কেউ যেন কাকে ডেকে চলে।

ইচ্ছে করে ভয়ানক ডাকে হাঁক দিই—হো ও ও ও
দারুণ শব্দের তোড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো
সবকিছু ছড়িয়ে পড়ুক।
যাবতীয় স্থাবর পর্বত
অতিদ্রুত অর্বাচীন ঘুরন্ত বিপ্লবে ভেসে যাক।
ঠোঁটের গালের সব রং
চামড়ার সব রং
চোখের হাড়ের
মজ্জার ভিতরে
স্থানচ্যুত ভাসমান হোক।

আমি যাত্নর আয়নাটাকে উল্টে দিয়ে
পুনরায় দারুণ হাঁকবো হো ও ও ও
আমি যাবতীয় রেখাগুলো ভেঙে দিয়ে
সেই মুখ আবার জুড়বো।

হঠাৎ নাড়ালে হাত

রোদ বড় ভালো লাগে—বড় ভালো
নরম দীঘল হলুদ সুন্দর তপ্ত।
চোখে চোখে রাখি
মারাং মচ্ছবে নাচা সুপ্রাচীন প্রেমিকের মত।
ডবকা রোদের দেহ মহুয়ার ঘ্রাণে বড় ভারী।

রোদের মুহূর্তে আসে।
চুড়চুড় বেবাক দেয়াল।
বাঘমুণ্ডী পাহাড়ের আতুড় শরীর
পটেরুর ঢলে লোনা।
এখন বিমল ধ্রুব সুধীর করবী
সমস্ত অচেনা—সব সুবেশ শরীর
বিগত জ্যোৎস্নায় লীন।
রোদের হাড়িয়া গিলে আমি এক প্রাচীন প্রবীণ
বৃদ্ধ যাদুকর।
হঠাৎ নাড়ালে হাত
সব ঘাস পাখি হবে
সব পাখি ঝড়
সব ঝড় উদ্দাম পবন।

হাত আমি নাড়াবো না।
রোদ, আমি রাবণের মত ভদ্র
তোমাকে ছোঁব না।

কার পাপ মানুষের কাছে কম ছিল

বাঘমুণ্ডির পাহাড়ে।
ধ্বাতিন তিন্‌না
উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় মাদল বাজে।
অর্জুনের ধবল বাকলে
দূরে কাছে···শালের মুকুলে
সর্বত্র জ্যোৎস্না খেলা করে।
মহুয়াগন্ধী মেয়েপুরুষ
বেরিয়ে আসে শব্দ ছুঁয়ে ছুঁয়ে

আমি পটেরুর উজ্জ্বল শরীরে চোখ রেখে
শব্দে বেহুঁশ হয়ে ভুলে যাই
অমিত প্রসূন পরিতোষ
কে আজ অনেক পথ ভেঙে
পটেরুতে স্নাত হয়ে
বেহুশ হয়েছে।

পরিতোষ ?   প্রসূন ?   অমিত ?

উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার ঢেউ
হাঁটু ছেড়ে বুকে উঠে আসে।

হে ঈশ্বর, এখনও জানাও
পটেরুতে স্নাত হয়ে
জ্যোৎস্নায় মহুয়ায়
মচ্ছবের বিপুল জোয়ারে
কার পাপ মানুষের কাছে
সবচেয়ে কম ছিল
কেবা আজ বেহুঁশ হয়েছে।

কবিতা লিখতে হবে

সুবাসিত কবিতা পাঠক কিছু রয়েছেন নাকি ?
অন্তত বন্ধুরা শুনি কেউ কেউ বলে।
হতে পারে এখনও দোকানে
ফুলের গ্রাহক কিছু আছে তাঁরা কবিতাও চান।

কী করে বোঝাই তবু
সুবাসিত কবিতারা দল কৌশলে খোলেনা।
ভোরের নরম রোদ, ভুফোঁটা শিশির কিছু অদ্ভুত বাতাস
জৈবিক সারের সাথে ঢেলে দিতে হয়
অথচ তা দোকানে মেলেনা।
মালঞ্চের সব জমি
ইঁট কাঠ লোহা ব্যাপারীর কাছে জমা
পৈত্রিক বাড়িতে ভাড়াটে।

এখন ভরসা শুধু পোষমানা টবের ক্যাকটাস।
ম্লান আলো পুরাণো দেয়াল
ভালোই বাড়ছে ওরা।
কিন্তু শুদ্ধ সুগন্ধী কবিতা ! আরো কি সহজ সুখী !
লাল ভোর, ছায়ার দুপুর, হলুদ জ্যোৎস্না, হাওয়া রাত !
কী করো জোগাই বলো,
মাটিতে যে বিদেশী ভাড়াটে,
ত্রিশঙ্কুর মতো আছি,
সিন্ধী বণিকের হাতে ছাদ।

পোষাক নেই বলে অন্ধকারে

সবইতো ঘর থেকে দু-পা ফেললেই :
উষ্ণ বাতাস, নরম নীল চাঁদ
লাল কুঁড়িতে ওথলানো বেপথু অশথ।
এমন ঋতুতে ইচ্ছের নটনটীরা বরাবরই তো নেচেছে, রাজা

তবু সেই সব সুরূপ সুরূপা নটনটীরা
আকাশে চাঁদ দেখলেই যারা
চমৎকার চমৎকার বলে হাততালি দিত
সারি সারি কুয়াশায় বিষণ্ণ বেঢপ।
ওদের আর সাজিয়ে নাচাতে পারবে না তুমি।
কোন পোষাকই গায়ে লাগবে না।
এরই নাম বোধহয় কিমাকার অবস্থা।

ওথলানো নদী আমেজী আকাশ
তুমিও তো আছ, রাজা।
আপাতত দারুণ পটকাবাজীতে ভয় দেখাচ্ছে না কেউ ;
তবু তুমিই বা কাকে দেখাবে, রাজা,
আমিই বা কী দেখাবো
ইচ্ছের নটনটীরা
পোষাক নেই পোষাক নেই বলে অন্ধকারে
কিম্ভূত হয়ে গেল

ধাবমান পুচ্ছের পেছনে

আমিও তো বসেছি অমনি
লম্বা পা-টা কাদায় ডুবিয়ে
বাহিরে ধ্যানস্থ তবু
দুই চোখে ব্যগ্র লাল আলো
দুধফেন আবরণে ঢাকা এক উৎকণ্ঠ কামনা।

ঐ লোভী বকগুলো—
তবু ওরা সময়ে ফুরোবে।
গোধূলি আলোকে হবে নভোচারী কমল কলিকা

আমার আকাশ নেই।
লম্বা পা-টা কাদায় ডুবিয়ে
কাটাবো স্বপ্নের রাত ধাবমান পুচ্ছের পেছনে

বেদম চ্যাঁচাতো

ঈশ্বর, কখনও কোন দুর্বল মুহূর্তে তুমি
কাছাকাছি এলে
যাবতীয় ভাঁড়ারের ঘনদুধ সরু চিঁড়ে কলা
চিকণ শীতল পাটি, সেনগুপ্তের ধুতি
আরো লোভনীয়
হয়তো কর্জ করে টেপ রেকর্ডারই একটা
উপহার দিয়ে
পৌরাণিক রাজাদের মত কোন শব্দভেদী বাণ চাইতাম

তারপর কী যে মজা (ভাবতেও পার না)
কী যে মজা হতে পারে ?
তামাম কুৎসিৎ নষ্ট বিবর্ণ বামন শব্দ
দুর্গন্ধ হলুদ—
গাড়ীয়াল, ঘড়িয়াল, গুম্ফদার চুড়িদার
স্ফীতোদর দাঁতাল শব্দের
স্ফোটনে ও বিস্ফোটনে
ঝাঁঝর পাঁজরওলা অতিবুড়ী আকাশটা
মিছাভয়ে বেদম চ্যাঁচাতো।

অভিনয়ে কষে ঘুম দেবো

মদের ভাণ্ডটি চোরে চেটে পুটে
সেরে রেখে গেল।
মঞ্চে আজ কী ভাবে যে যাবো ?
বাহিরে দর্শক চেঁচায় ক্রমশঃ জোরে-
ড্রপসিন তোলো।
অগুন্তি মানুষ অন্ধকারে উস্কুখুস্কু—
গদাযুদ্ধে কে হারে কে জেতে !
যার খুশি সে জিতুক
আমি আজ গ্রীণরুমে
মাতালের অভিনয়ে কষে ঘুম দেবো ॥

লুকানো মদের ভাঁড় জুয়াচোরে
শেষ করে দিলে
সাদা চোখে পেশাদারী অভিনয়
করা যায়, বলো ?

কখনও তোমার মুখ

কখনও তোমার মুখ
দেখতেও ভালো লাগে কত।
কুয়াশার মত আবছায়া
বৃষ্টি ঝরে কবুতর ধূসর পাখায়।
খ্যাপাটে বাতাস
গ্রামীন ধূলোট এক পুরাতন কাঁথা
মাঝে মাঝে ঝাড়ে আর ছোটে।

তখন তোমার মুখ
বন্য চুল ভুরু নাক ঠোঁট
পৃথিবীর সনাতন ধূলোয় জড়িয়ে
কানিশের কবুতর পাখার মতন
জান্তব নরম তাপে
ওথলায়—ভেঙে যায়—
ভেঙে ফুটে ওঠে
কুয়াশার মত এক আবছায়া
জটিল বৃষ্টিতে।

নিঃশব্দ হিমাঙ্কে নেমে যেতে

ঝড়জল অন্ধকারের দিন শেষ হয়ে যাক-
বন্ধ জানালায় উত্তেজিত আঘাত করে
বলেছি একদা।
আমাদের গায়ে মাথায় এখন
আকাশের আলো
আমাদের গেরোবাজ পায়রার ঝাঁক
রমনীয় ভঙ্গি নিয়ে
মেঘভাঙা রোদে ঝিকমিকিয়ে উঠছে।
আমরা কি এখন অনেক জোরে
হেসে উঠব না ?

আমরা অনেক জোরে হাসবার জন্য
হাঁ করেছি।
দ্যাখো কি মজাটা
তক্ষুণি গেরোবাজ পায়রাগুলো
টুপ করে নিভে গিয়ে খসে পড়ছে কোথায়
আমাদের গায়ে মাথায় এখন
ছায়ার বাদুড়ের মত শীতল অন্ধকার।

অন্ধকারে শীতলের মা
চেঁচিয়ে কাঁদছে।
আমাদের বুকের মধ্যকার বাতাস
রোদ্দুরে রোদ্দুরে অনেক গরম হয়ে উঠেছিল।
এখন ক্রমাগত শীতলরে শীতলরে শুনে
কাঁপতে কাঁপতে বৃষ্টির মত গড়াতে লাগলো।
বাইরের উজ্জ্বল আকাশের নীচে
হাসতে গিয়ে হাঁ করে আমরা
নিঃশব্দ হিমাঙ্কে নেমে যেতে লাগলাম।

তারপর সব কিছু

তারপর সব কিছু মিশে যাবে ভীড়ে
ধর্মতলা শেয়ালদা বা মৌলালীর মোড়ে.
একাকার হবে সব।
কালো কটা বেনী বা কবরী
গৈরিক বা অতিগাঢ় পাটল কামিজ
তসর গরদ
কিংবা অর্ধ-নারীশ্বর হিপ্পির দেয়ালা।

তারপর নিশ্চিতই মিশে যাব ভীড়ে।
তুমি আমি কফির পেয়ালা
যতক্ষণ হাতে থাকে
কথা বল
রাতরং নদীর বিভবে
ক্যাবারের মেয়ে চাঁদ আলো আর কুহক ছড়াক।

ক্যাবারে নাচুনী চাঁদ নিশ্চিতই দ্রুত চলে যাবে।
হাওয়ার কৌতুকে
আবিরের মত কিছু চুল থেকে ঝরে গেলে ফের
ধর্মতলা মৌলালীর ভীড়ে শুধু স্রোত হয়ে যাব।

কে কাকে যে ডাকে

কে কাকে যে ডাকে বারবার।
আসে কিংবা আসেনা সে
তবু এই আসা না আসার
মাঝখানে জেগে থাকে
নদী ঢেউ বিষণ্ণ আষাঢ়
উড়াল হাওয়ার ঝড়
ঘূর্ণমান জলের জোয়ার।

আরো অন্ধকার ঘরে

পর্দাটাই নড়ে চড়ে ; ভাদ্রের গুমঠে পচে ;
মাঝে মাঝে ঝড়ে ঈষৎ বা কেঁপে ওঠে ;
তখনই ভীষণ ভয়ে জড়োসরো হয় ।
যেন আরো কিছু হাওয়া হলে সর্বনাশ হবে,
যেন সব বদ্ধ মজ্জা মাছেরবাজারী গন্ধ
বেরিয়ে গেলেই
ছ্যাদা বেলুনের মতো ফট করে শূন্যে ফেটে
তারে লটকাবে ।

তবু ভাদ্রের গুমঠে রংচটা সনাতন পর্দাটাই
কিশোরীর মত গুরু গুরু বুকে কাঁপে ;
ঈষৎ অসৎ হানাদার হাওয়াটার
ছোঁওয়া পেতে চায় ।

অকস্মাৎ অজানা দারুণ ভয়ে ভীষণ কুঁচকিয়ে
ঘরের ভিতরে আরো অন্ধকার ঘরে
যেতে চায় ॥

না

না আমি ছিঁড়বো না কুঁড়ি। কুঁড়িগুলো ভীষণ রক্তিম,
এবং খানিক বন্য, তাই যত সাবধানী মন
দ্বিধায় জড়ায় আর রূপালী মাছের মত হিম
দেহ দিয়ে ওরা চাব দেয়ালেই সমুদ্র সাজায়

না আমি ছিঁড়বো না কুঁড়ি। নার্শারীর দামী পারিজাতে
সাজাব না ঘর। আমি আরণ্যক ফুল ভালবেসে
অরণ্য বাসিতা লতা দুয়ারে পুঁতেছি এই হাতে
যে অরণ্যে অন্ধকার দামাল চুলের মত কালো।

না আমি ছিঁড়বো না কুঁড়ি। জানি তুমি খেলুরিয়া মন
কখন বা হয়ে ওঠো। নিজেরই ছায়ায় ভয় পাও
সুপ্রাচীন অন্ধকার অরণ্যের জটিল স্বনন
মাটির আদিম ঘ্রাণ অতএব দ্বিধায় এড়াও।

না আমি ছিঁড়বো না কুঁড়ি। স্ফূট হোক মর্ম্মমূলী লাল
এ পটের মুখে, ছিঁড়ে স্বরচিত মুখোশের জাল।

দিঘিটা শুকোবে

নৈঃশব্দ অসহ্য।
তাই জানি আমি, তুমি বারবার
চেয়েছ অনেক মেঘ
বৃষ্টি ঝড় তুফান তুমুল।
কারণ দিঘির পটে আঁকা
অই শান্ত নীল জলে
রঙ্গমতী মরালের সুমন্থর সহজ চারণা
বহু যাপনায় ক্লান্ত।

তুমি চাও বুঝি
কোমল কম্পিত ভীত সচকিত কবোষ্ণ পালক
কাছাকাছি
দুহাতে জড়াতে।

একটি নিঃশ্বাসও আমি ফেলব না অথচ।
উড়ে গেলে একবার শ্বেতগ্রীব হাঁস
আর আসিবে না ফিরে।
দিঘিটা শুকোবে।

উজানে

কে আমার নাম ধরে বারবার ডাকলো ?
অথচ পিছু ডাক দিতে মানা করেছি সবাইকে :
পিছু ডাক শুনবো না এমন এক শক্ত শপথও
হৃদয়ের কাছে উচ্চারিত ছিল মনে হয়।

তবু দূর সাগরের ঢেউ দেখে ভিতরে কেঁপেও
মাঝিকে যখন আমি আরো কিছু উজিয়ে যাবার
কথা বলেছি—
সমস্ত কল্লোল ঢেকে রক্তের গভীরে
কি দারুণ ধমকালো।

কে বললে আবার তুমি ফের।
তুমি অনেক দেখেছ।
অনেক এসেছ পথ উষ্ণ ও শৈত্যের ঢেউয়ে
লুটোপুটি খেয়ে।
তুমি শান্ত জনপদ ও পিঙ্গল ধানের ক্ষেত
ছেড়ে এসে ঢের সুন্দরী কাঠের বনে
পল্লবের দুরন্ত দোলন অনেক দেখেছ।

সাপ কিংবা শুশুক কুমীর—
সবকিছু দেখে আজ সাগরের মুখে এসে গেছ।
সাগরে পড়লে নাও পথ খুঁজে পাবে না,
অথচ তুমি তো বুকের কাছে ঠিকানাটা রেখেছ এখনো।

আমি লবণাক্ত স্রোতে ছায়ার মিছিল দেখলাম
ঘণ্টা শুনলাম······এবং তখনই
মাঝিরা হাঁকলো সামাল সামাল।

কে আর নাবিক নয়

নাবিক
বুকের মাঝে সুপ্রচুর স্রোতে ভাসা
অবিরাম নাম।
কে আর নাবিক নয় ?
আকাশে বা বহমান সাগরদোলায়।
সব ক্লান্ত নাবিকেরা নিকটে বা দূরে
ঘরে ফেরে ;
ধূলি ধূসরিত জানু প্রেমিকার কাছে ক্ষমা চায়,
বেদেনি চাঁদের মুখ দেখে তবু
শিশুটির দিকে পাশ ফেরে।
ভীষণ শব্দের রাতে আদিগন্ত তবু কেঁপে গেলে
পুরোনো পৃথিবী
পুরাতন জন্ম মৃত্যু শব্দ যত
অকস্মাৎ গুঁড়ো হয়ে যায়।

পাহাড় প্রমাণ ঢেউয়ে অনর্থ শব্দেরা
রক্ত দারুণ দোলালে
যাবতীয় প্রাচীন নাবিক
ভেসে যায় পৃথিবীর যাবতীয়
অনর্থক কোনায় কোনায়।

সন্ন্যাসী বান্ধবীকে

সে মেয়ে জানলা দিয়ে দূরপারে দীর্ঘ পলাশের
রক্ত শোভা দেখে
ভেবেছিল ঐখানে
ঐ ধূ ধূ দিগন্তের গায়ে
যেখানে মাটির সব রস শুষে ক্রুর কিংবা
বসন্ত খেয়ালী
মোমের মতন যত কামনায় আগুন দিয়েছে—
ওখানে গেলেই
মন তার মোম হয়ে গলে গলে
শিখা হয়ে যাবে।

সে মেয়ে মনের মত এক মোম নিয়ে
ঘরে কাল কাটিয়েছে।
কত বাতি তার পাশে কতবার জ্বলে জ্বলে
দীপাবলী হলো;
তবু দেশলাই তার বারবার কেন যে হারালো?
নাকি তাকে বারবার আনমনা করেছিল
দূরের আগুনই!

সে মেয়ে অনেক পথ শূন্য মাঠে হেঁটে হেঁটে
পলাশের কাছে চলে গেল।
আমি জানি, এ শুধু দৈবই, যদি
দেশলাই তার মিলে যায়
কাছাকাছি কোনো
নিরালা দোকানে।

সেই চৈত্রের ছড়া

এপার বাংলা ওপার বাংলা মধ্যে সীমার চর
তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন শেখ মুজিবর।
মুজিব এলেন দুয়ারে ভাই দুয়ার গেল খুলে
আগুন জুড়ে বসল তারা নিশান দিল তুলে।
'জয় বাংলা' জয় বাংলা' বুকের মধ্যে কাঁপে
ভীরু হৃদয় উঠল বসে সেই কাঁপনের দাপে।
ধূ ধূ শিখায় পুড়ছে ঢাকা পোড়ে যশোর চাটগাঁ
মনস্তাপে পুড়ছে জ্বলে এপারে মাঠ হাট গাঁ।
এপারে মাঠ হাটে রে ভাই রক্তপলাশ ফোটে
সেই পলাশে লক্ষ ভাইয়ের মুখটি জেগে ওঠে।
লক্ষ ভাইয়ের লক্ষ বোনের লক্ষ শিশুর মুখ
অহর্নিশি আর্তনাদে যায় রে ফেটে বুক।
সর্বনাশা চৈত্র এবার নাই রে জলে স্থলে
চৈত্র এবার লক্ষ চিতায় বুকের মধ্যে জ্বলে।

কোনো বন্ধুকে

তোমাকে মানবী বলে নিশ্চিত জেনেছি।
রক্তমাংসে গড়া দেহ সুখ দুঃখে
দুলে দুলে ষড়রিপু
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া।

দেবাংশিনী
গরিয়সী নও, তাই অতি অনায়াসে
আমার মানবী হাত
তোমার নরম উষ্ণ হাত নিয়ে
অসংকোচে খেলা করেছিল।

তোমাকে মানবী বলে
নিশ্চিত জেনেও, দ্যাখো, বুকের ভিতরে
অমল আসন এক কে যেন কখন
চুপে পেতে রেখেছিল
হয়তো আরেক মন
আমারই যখন
ক্রমাগত বৃষ্টিতে শিশিরে হেঁটে
বড় বেশী চলে গেছে কাদাজল ভেঙে।
তখন বুকের মধ্যে
রৌদ্রের প্রার্থনা নিয়ে তোমাকেই ছুঁয়ে

দেখেছি হলুদ স্রোতে
তোমার মাটির মুখ দেবী হয়ে গেছে।
তখন দেখেছি মুখে
জল মাটি কাদা ছুঁয়ে অনাহত আলোকের খেলা।
সে খেলায় মেতে উঠে
আমিও তোমার সাথে কতবার
আকাশে ডুবেছি।

আগুন খুঁজেছিলে

তুমি তার চোখের দিকে তাকিয়েছিলে
সে তাকায় নি।
হয়তো তুমি আকাশ খুঁজেছিলে
অথবা রোদ্দুর
চাঁদ ফুল হাঁস কিংবা হরিণ,
সে জানে নি।

সে তোমার চোখের দিকে তাকায় নি ;
সে তোমাকে চোখের মণি দেখায় নি।
কারণ সেখানে
চাঁদ ফুল হাঁস কিংবা হরিণ কিছুই ছিল না।
শুধু ছিল আকাশছোঁয়া ঢেউ।

অথচ তুমি তো আগুন খুঁজেছিলে

সেই ভীড়ে জীবন থাকবে না

জীবন বড় মজার ছেলে।
দূরে চলে যাও, ছুটে গিয়ে পায়ে ধরবে।
ওর শোকাতুর চেহারা
রুক্ষ চুল চোখের আগুন
মায়া হবে দেখে।

জীবন বড় মজার ছেলে। সাবধান।
মায়া হলেই পেয়ে বসবে তোমায়।
পা দুটো মেলে দিয়ে বলবে—টেপো।
টিপিয়ে নিয়ে বলবে
তোমাকে ঠিক ক্রীতদাসীর মত দেখাচ্ছে;
ক্রীতদাসীদের ঘেন্না করি।—বলে
হা হা করে হেসে উঠবে।

জীবন বড় মজার ছেলে। পালাও পালাও।
বেশি দূরে না গেলে আঁচল ধরে
টেনে আনবে আবার।
দু পয়সার চানাচুর খাইয়ে
সারারাত নাচিয়ে নেবে।
ভোর বেলায় এলোমেলো পড়ে থাকবে তুমি
চারপাশে ভীড়।
সেই ভীড়ে জীবন থাকবে না।

—